হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ

স্বাধীনতার চেতনা এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবী

একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী জামাতের বিচারের দাবিটা এখন জাতীয় দাবিতে পরিনত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন দাঁড়ায়– তাহলে এই দাবিটা এত বছর পরে কোনো? বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ ধরনের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দৃষ্টান্ত যা রয়েছে এবং তা যদি অনুসরণ নাও করি তারপরও আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে বিরাজমান আইন কিংবা গোটা জাতির ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে নতুন আইন প্রনয়ণ করেও কুখ্যাত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা যেতে পারে। আমরা কে-না জানি, কারা বা কোন গোষ্ঠী স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে– কারা হানাদারদের সহযোগিতা করেছে, কারা নর-হত্যা, নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ কিংবা লুটপাট, অগ্নিসংযোগসহ ধরনের নারকীয় কর্মকাণ্ড চালিয়েছে মহান মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে। তারপর এত কিছুর পরেও যারা স্বাধীন দেশে স্বাধীনতাকে মানতে পারেনি– স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রতি কটাক্ষ করে থাকে, যারা বা যে চক্রটি এত বছরেও সংশোধন হতে পারেনি– যারা এখনো যুব শক্তির একটা অংশকে বিপদগামী করে তুলছে– তাদের কঠোরভাবে বিচার করা না হলে জাতির ভবিষ্যত অন্ধকারের অতল গহবরেই হারিয়ে যাবে। আর এই চক্রটিই যুদ্ধাপরাধী হিসেবে গোটা জাতির কাছে পরিচিত।

এ দেশের নব্বইভাগ মানুষই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেছে। দুর্ভাগ্য আমার। জাতীয় জীবনের সেই পরম প্রয়োজনের সময় আমি পাকিস্তানের বন্দী শিবিরে আটক ছিলাম। মাত্র কয়েকটা দিনের জন্য আমি প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারলাম না। সেনাবাহিনীতে চাকুরী করার কারণে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হবার মাত্র পঁচিশ দিন আগে আমাকে পোষ্টিং নিয়ে তৎকালিন পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যেতে হলো। এদিকে আমার তৃতীয় ইষ্ট- বেঙ্গল রেজিমেন্ট, আমি যার কমান্ডিং অফিসার ছিলাম– সেই রেজিমেন্ট বীর বিক্রমে মুক্তি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লো। আমি সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলাম। হাতে অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করতে পারলাম না। তবে আমার মন সেদিন ঠিকই যুদ্ধ করেছে মুক্তির জন্য। প্রতিনিয়ত মুক্তির প্রহর গুনেছি। তারপর এক সময় স্বাধীন দেশের মাটি স্পর্শ করে মনে মনে অঙ্গীকার করেছিলাম– যে দেশ মুক্ত করতে অস্ত্র ধরতে পারিনি– সেই দেশের সেবা করে দায় মুক্ত হবার চেষ্টা করবো এবং যে মহান সন্তানেরা যুদ্ধ করে দেশকে স্বাধীন করেছে তাদের কল্যানে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উর্দ্ধে তুলে ধরে যুদ্ধোত্তর দেশের অবশিষ্ট কাজ সম্পন্ন করবো।পরম করুনাময় আমার সেই ইচ্ছা পুরনের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। সেই সুবাদে যা করেছি এই আলোচনায় তার কিছু উল্লেখ করতে চাই। তবে তার আগে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত মহলের বিচার প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিটা এখন কেনো–সে প্রসঙ্গ নিয়েই শুরু করছি। সময়ের দাবি বলে একটা কথা আছে। আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রেক্ষাপট কিন্তু ৭১-সালে হঠাৎ করেই সৃষ্টি হয়নি। ৫২-এর মহান ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতা সংগ্রামের সুত্রপাত। তবে জাতি কিন্তু তখনই স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করেনি। এই যুদ্ধের চূড়ান্ত রূপ নিতে আরো উনিশটি বছর লেগে গেছে। এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টাও সেভাবে বিবেচনা করতে হবে। ৭১-এর ডিসেম্বরে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয় এলো। তারপর এদেশীয় যুদ্ধপরপাধীরা আমাদের মাঝেই থেকে গেলো। তারা সংশোধনের অনেক সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু কৃতকর্মের জন্য এরা ক্ষমা প্রার্থনাও করেনি এবং নিজেরা সংশোধনও হয়নি। যুদ্ধের সময় হয়তো কেউ ভয়ে অথবা ভুল বুঝে কিংবা প্রলোভনে বিপদগামী হয়েছিলো। হয়তো তাদরে সংখ্যাও ছিলো সামান্য। অতঃপর তারা সংশোধিত হবার সুযোগ পেয়েছে। এই সুযোগের জন্যেও কিছুটা সময়ের প্রয়োজন ছিলো। ধরে নিতে হবে– স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এখন পর্যন্ত যে সময়টা অতিবাহিত হয়েছে– সেই সময়টাই ছিলো এই সুযোগের সময়। কিন্তু এখন একটি বিষয়ে জাতীয় ঐক্যমত সৃষ্টি হয়েছে। এভাবেই সময়ের দাবিতে নতুন প্রেক্ষাপট সৃষ্টি হয়। এখনকার প্রেক্ষাপটে জাতীয় ঐক্যমত সৃষ্টি হয়েছে– জামাতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা এবং যুদ্ধাপরাধী হিসেবে তাদের বিচার করার জন্য। সময়ের এই দাবিকে উপেক্ষা করার কোনো অবকাশ নেই। এটা প্রসব বেদনার মতো– সন্তান ভুমিষ্ট না হওয়া পর্যন্ত ব্যাথা থাকবেই।

বর্তমান সময়ে গভীরভাবে উপলব্ধী করছি জাতিকে কলুসমুক্ত করতে জামাতের রাজনীতি নিষিদ্ধ করা এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার আর কোনো বিকল্প নেই। জাতি যুদ্ধাপরাধীদের চিনে, তারা কোথায় কি করেছে– এ দেশের মানুষ তা জানে। ৭১-এর সেই পরাজিত শত্রুরা সুযোগ পেয়ে প্রতিশোধ নেবার জন্য থাবা বিস্তার করেছে। ভুল রাজনীতি এবং ক্ষমতার লোভের সুযোগ ব্যবহার করে এরা মাথাচারা দিয়ে উঠেছে। ওই সব নরপিশাচেরা জাতীয় পতাকা ব্যবহার করে স্বাধীনতাকেই বিদ্রুপ করেছে। সেই কালোযুগের যখন অবসান ঘটেছে– তখন পুরোপুরি কলুসমুক্ত করার বাকি কাজটুকুও এই সরকারকে করতে হবে এবং এটা বর্তমান সরকারের অঙ্গীকারও ছিলো। ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করা কিংবা ক্ষমতায় যাবার সিঁড়ি রচনা করার কুৎসিৎ রাজনৈতিক তৎপরতার সময় শেষ হয়ে গেছে। আশার কথা যে, যারা একদা যুদ্ধাপরাধীদের সাথে হাতে হাত- কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ক্ষমতায় যাওয়া বা থাকার রাজনীতি করেছিলেন– তাদের মধ্যে অনেকেই এখন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করছেন। এখন চট্টগ্রামের বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও বুদ্ধিজীবী কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ নতুন চন্দ্র সিংহের ছেলে বলতে পারছেন– সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী নিজ হাতে গুলি করে তার বাবাকে হত্যা করেছেন। তিনি রাউজানের গণহত্যায়ও নেতৃত্ব দিয়েছেন। এরকম লাখো শহীদের সন্তান-সন্তুতি-আত্মীয় স্বজনেরা খুনীদের চিনে রেখেছে– তাদের প্রতিনিয়ত দেখছে– অথচ কিছু বলতে পারেনি। আজ গোটা জাতি সোচ্চার হয়ে উঠেছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে। এটা হঠাৎ সৃষ্টির বিষয় হতে পারে না। হয়তো তাই ৩৮ বছর কেটে গেছে। আজ আমরা আর অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে চাই না। অতীতের ভুল থেকে আমাদের শিক্ষা নিতে হবে। অতীতে যারা ভুল করে এবং লোভের বসে যুদ্ধাপরাধীদের সাথে নিয়ে রাজনীতি করেছেন– তাদের সেই ভুল সিদ্ধান্তের জন্য আর কোনো কটাক্ষ করা ঠিক হবে না– যদি তারা উজ্জ্বল দিনের প্রত্যাশায় কলঙ্ক মোচনের সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেয়।

আমাদের মহান স্বাধীনতা আর কোনোভাবে কলুসিত হোক– জাতি তা মেনে নেবেনা। আমরা আর কোনোভাবে শুনতে চাইনা স্বাধীনতা সংগ্রামকে কেউ গৃহযুদ্ধ বলে অবিহিত করুক। এই স্বাধীনতাকে আমি স্মরণ করি হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধ্যা ও ভালবাসা দিয়ে। এই স্বাধীনতার জন্য যারা যুদ্ধ করেছেন, তাদের আমি দেখেছি এবং এখনো দেখছি– এ দেশের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান হিসেবে। শুরুতেই বলেছি এই স্বাধীন দেশের গর্বিত নাগরিক হয়েও আমি নিজেকে বড় হতভাগা মনে করি। কারণ আমি এ দেশের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তানদের তালিকায় নিজের নাম সংযুক্ত করতে পারিনি। একজন সৈনিক হিসেবে দেশ মাতৃকার মুক্তির সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে না পারার যন্ত্রনা আমাকে সর্বদাই ক্ষতবিক্ষত করেছে। কারণ সে সময় আমি পাকিস্তানে আটক ছিলাম। পশ্চিমারা আগে থেকেই পরিকল্পনা অনুসারে তাদের দৃষ্টিতে সন্দেহভাজন বাঙালী অফিসারদের তৎকালিন পশ্চিম পাকিস্তানের সেনা শিবিরে নিয়ে গিয়েছিলো। বীরশ্রেষ্ঠ মতিউর রহমান বিমান বাহিনীতে ছিলেন বলে তিনি পালানোর চেষ্টা করে শহীদ হয়েছেন। আমার ক্ষেত্রে সে সুযোগও ছিলা না। তাছাড়া কয়েক হাজার আটক বাঙালী সৈনিকের বাঁচা-মরার বিষয়টিও নির্ভর করছিলো আমার উপর। কারণ আমি ছিলাম একটি ব্যাটেলিয়নের কমান্ডিং অফিসার। তারপরও মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহনের জন্য পালানোর পরিকল্পনা করেছিলাম এবং চেষ্টাও করেছিলাম। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানি সাহেবের গোপন বার্তা পেয়ে সে পরিকল্পনাও পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলাম। কারন আমি পালিয়ে আসলে অন্যান্য বাঙালী সৈনিকদের জীবন বিপন্ন হতো। ১৯৭১-এর মার্চ থেকে ১৯৭৩-এর অক্টোবর পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময় বেলুচিস্তানের লোরালাই বন্দি শিবিরে আটক থাকার যন্ত্রনার কথা মনে পড়লে এখনো আতঁকে উঠি। দেশ স্বাধীন হবার পর বন্দী বাঙালীদের উপর নির্যাতনের মাত্রা বেড়ে গেলেও মানষিক প্রশান্তিতে কোনো যন্ত্রনাই আর যন্ত্রনা মনে হয়নি। কারন এই ভেবে শান্তি পেতাম যে– আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছে। এখন যদি মরেও যাই, তাহলেও কোনো দুঃখ পাবোনা। ভেবেছি মরলেও শহীদের মর্যাদা লাভ করবো। গোটা জাতি স্মরণ করবে– দেশের স্বাধীনতার জন্যই আমাদের জীবন দিতে হয়েছে।

অতঃপর মহান আল্লাহর অসীম রহমতে স্বাধীন দেশে ফিরে এলাম। দেশে ফেরার সেই আনন্দের কথা কোনো ভাবেই ভাষায় বর্ণানা করতে পারবো না। স্বাধীনতা আমার কাছে সেই পরশমনি– যার ছোঁয়ায় আমি আট বছরের সেনা প্রধান এবং নয় বছরের জন্য এই স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রপতি হবার সুযোগ পেয়েছি। স্বাধীনতা আমার সেই পরশমনি– যার ছোঁয়ায় আজ আমি এদেশের একজন রাজনীতিবিদ, একজন সংসদ সদস্য। যখন সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহন করলাম, তখন স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে বলেছি– হে স্বাধীনতা, তুমিই আমাকে দিয়েছো এত বড় দায়িত্ব! সেই স্বাধীনতাকে কেউ কটাক্ষ করুক কিংবা আমার চেতনাকে আঘাত করুক– তা কোনো ভাবেই মেনে নিতে পারিনা। সে কারনেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে সকলের সাথে আমিও সোচ্চার।

বর্তমান মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরিবর্তিত পরিবেশে মহান স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস এবং ঈদ উদযাপিত হয়েছে। অনেক দিন পর সাধারন মানুষের স্বস্তির নিশ্বাসের মধ্যে তোপধ্বনি শোনা গেছে। হিংসা-প্রতিহিংসা কিংবা কোনো রেষা-রেষির মধ্যে নয়- সম্পুর্ণ মুক্ত পরিবেশের বাতাসে পতাকা উড়েছে। এটাই বড় আশার কথা। আশা করি, এই পরিবেশের ধারাবাহিকতা আগামীতে রক্ষা পাবে– যুদ্ধাপরাধী মুক্ত বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে। সীমাহীন ত্যাগ করে আমরা যে মহান ইতিহাস সৃষ্টি করেছি– তার মর্যাদা রক্ষা করাই হবে আগামী দিনের লক্ষ্য।

Email: ershad.hm@gmail.com